ইউনিট ১

সূচনা
Introduction

ক্রেতা ও ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য প্রস্তুত করে তা বাজারে সরবরাহ করার জন্য বিপণন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম, যার মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্রেতা বা ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জন করে। এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বিপণনকারীদেরকে প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। কারণ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভোক্তার রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। আবার প্রতিযোগীতাও তীব্র আকার ধারণ করেছে। সে কারণে ক্রেতা সম্পর্ক সৃষ্টি ও তা ধরে রাখার ব্যাপারে বিপণনকারীদেরকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এ ইউনিটে বিপণন কী ও বিপণন কিভাবে ক্রেতা সম্পর্ক সৃষ্টি করে সেই সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে।

এ ইউনিটে মোট ছয়টি পাঠ আছে। প্রথম পাঠে বিপণনের ভূমিকা, বিপণনের সংজ্ঞা, বিপণনের মৌলিক ধারণা ও বিপণন ব্যবস্থাপনার মতবাদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে কৌশলগত বিপণনের সংজ্ঞা, কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনার ভিত্তি এবং কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি ও কার্যসমূহ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পাঠে বাজার পরিচিতিকরণ, বাজার পরিচিতিকরণের সুবিধা এবং বাজারমুখি কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পাঠে বাজারমুখি বিপণন কৌশলের বৈশিষ্ট্য, ক্রেতা ভ্যালু এবং ক্রেতা ভ্যালু অর্জনের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম পাঠে ক্রেতামুখি বিপণনের কৌশলসমূহ প্রণয়ন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বশেষ ষষ্ঠ পাঠে সামর্থ্যের সংজ্ঞা ও পার্থক্যসূচক সামর্থ্যের ধরণসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১: ভূমিকা, বিপণনের সংজ্ঞা, গুরুত্ব, বিপণনের মৌলিক ধারণা ও বিপণন ব্যবস্থাপনার মতবাদসমূহ
পাঠ-১.২: কৌশলগত বিপণনের সংজ্ঞা, কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি, কার্য ও ভিত্তিসমূহ
পাঠ-১.৩: বাজার পরিচিতিকরণ, বাজার পরিচিতিকরণের সুবিধা ও বাজারমুখি কৌশলসমূহ
পাঠ-১.৪: বাজারমুখি বিপণন কৌশলের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, ক্রেতা ভ্যালু এবং ক্রেতা ভ্যালু প্রদানের উপায়সমূহ
পাঠ-১.৫: ক্রেতামুখি বিপণন কৌশল, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য
পাঠ-১.৬: সামর্থ্যের সংজ্ঞা, পার্থক্যসূচক সামর্থ্যসমূহ, সামর্থ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ এরং সামর্থ্যের ধরণসমূহ

পাঠ ১.১

ভূমিকা, বিপণনের সংজ্ঞা, গুরুত্ব, মৌলিক ধারণা ও বিপণন ব্যবস্থাপনার মতবাদসমূহ
Introduction, Definition, Importance & Core Concepts of Marketing, and Philosophy of Marketing Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিপণন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারবেন
- বিপণনের গুরুত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বিপণনের মৌলিক ধারণাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- ক্রেতা ভ্যালুচালিত বিপণন কৌশল নকশা সম্পর্কে জানতে পারবেন
- বিপণন ব্যবস্থাপনার মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যুগ যুগ ধরে মানব জাতির প্রয়োজন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য নানা প্রকার পণ্য ও সেবার আবির্ভাব হয়েছে। এই যে, আমাদের প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠে 'টুথপেষ্ট' দিয়ে দাঁত মাজা, রুটি বা পরোটা দিয়ে নাস্তা করা, রিকসা বা গাড়িতে চড়ে স্কুল-কলেজে যাওয়া, অসুস্থ্য হলে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া এবং প্রতিদিন নিত্য পয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করা, এসবের মূলেই কিন্তু বিপণন বিষয়টি জড়িত। বিপণন শব্দটি 'মার্কেটিং' বা 'বাজারজাতকরণ' নামেও আমাদের দেশে অধিক পরিচিত। বিভিন্ন লেখক-গবেষকগণও তাদের লেখনীতে বিপণন বা বাজারজাতকরণ বা মার্কেটিং শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ধারণা করা হয় যে, ১৭০০ থেকে ১৮০০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিপণন ধারণাটির সূত্রপাত হয়। তবে বিপণনের গতিশীলতা শুরু হয় ১৯৪০ সাল থেকে। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বিপণন ধারণার শুরু ১৯৬০ সাল থেকে। বিপণনের গুরু নামে খ্যাত আমেরিকার নর্থ-ওয়েস্টার্ন-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফিলিপ কোটলার এর লেখনীতে বিপণন ধারণাটির ব্যাপকতা লাভ করেছে।

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে, সেই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে বিপণন দর্শনেরও। মৌলিক বিপণন ধারণার সাথে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ধারণা ও আধুনিক কলা-কৌশলের। মূলত বিপণন হলো এমন একটি সমন্বিত কার্যাবলী যা ক্রেতাদের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করে এবং বিনিময়ে ভ্যালু অর্জনের জন্য শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্ক গড়ে তোলে। আধুনিক বিপণনকারীকে বাজারে ক্রেতার অবস্থান, তাদের প্রয়োজন অনুধাবন, তাদেরকে সর্বোচ্চ ভ্যালু প্রদান, ক্রেতামুখি কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হয। আর তা করতে গিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বিভিন্ন কলা-কৌশল পরিবর্তন করতে হয়। তাই এ পাঠে বিপণনের সাধারণ ধারণা, বিপণনের সংজ্ঞা, বিপণনের গুরুত্ব, বিপণনের মৌলিক বিষয়াবলী এবং বিপণন ব্যবস্থাপনার দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিপণনের ধারণা
Cocepts of Marketing

বিপণন ক্রেতা সেবার একটি পরিবর্তনশীল ও জটিল বিষয়। অনেক সময়ই বিপণন বা মার্কেটিং দিয়ে শুধু ক্রয়-বিক্রয় বা প্রচারণাকার্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, বিপণন ক্রয়-বিক্রয় বা প্রচারণা ছাড়াও পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ, আকর্ষণীয় মোড়কীকরণ, মূল্য নির্ধারণ, পরিবহন, প্রসার ইত্যাদি কাজ করে। বর্তমান সময়ে বিপণন বলতে সন্তোষজনকভাবে ক্রেতা বা ভোক্তার প্রয়োজনসমূহ পূরণকে বোঝায়। বিপণনের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা ভ্যালু বা সুবিধা সরবরাহের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নতুন ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা এবং ক্রেতা সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে বর্তমান ক্রেতাকে ধরে রাখা ও সন্তুষ্ট ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। পণ্য উৎপাদনের পূর্ব থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত বিপণন বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে জড়িত থাকে।

বিপণনের কাজকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; যথা: পণ্য উৎপাদনের পূর্বে, পণ্য উৎপাদনের পরে এবং পণ্য বিক্রয় করার পরবর্তীতে। পণ্য উৎপাদনের পূর্বে বিপণনের কাজগুলো হচ্ছে বাজার জরিপ, চাহিদা নির্ধারণ, অর্থ-সংস্থান, প্রতিযোগীদের চিহ্নিত করা ইত্যাদি। উৎপাদনের পরে বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মান নির্ধারণ, বিভক্তিকরণ, মোড়কীকরণ, মূল্য নির্ধারণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বণ্টন, ঝুঁকি গ্রহণ, পণ্য প্রসার ইত্যাদি। সর্বশেষে পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া অথবা পণ্য ভোক্তার কাছে বিক্রয় করা হলেই বিপণনের কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় না। ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর পরও বিপণনের কিছু কাজ থাকে। যেমন- বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান, ভোক্তা বা ক্রেতার সন্তুষ্টি পরিমাপ, সন্তুষ্টি বজায় রাখা এবং বৃদ্ধি করা, বিপণনের নানাবিধ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বিপণন হচ্ছে একটি সামাজিক ও ব্যবস্থাপকীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক পণ্য বা সেবা বিনিময় করার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়।

Philip Kotler & Gary Armstrong বিপণনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে, "Marketing is a social and managerial process whereby individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others." অর্থাৎ বিপণন হচ্ছে একটি সামাজিক এবং ব্যবস্থাপকীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গ এবং দল অন্যদের সাথে পণ্যদ্রব্য ও ভ্যালু সৃষ্টি এবং বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করে থাকে।

American Marketing Association (AMA) বিপণনের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছে তা হলো, "Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large." অর্থাৎ বিপণন হলো কার্যক্রম, কোম্পানির সেট এবং বিক্রয়ের প্রস্তাব সৃষ্টি, যোগাযোগ, সরবরাহ ও বিনিময়ের প্রক্রিয়া যা ক্রেতা, গ্রাহক, অংশীদার ও বৃহত্তর সমাজের জন্য সুবিধা প্রদান করে।

তাহলে বলা যেতে পারে যে, বিপণন হলো একটি ভোক্তামুখি, ব্যবস্থাপকীয়, সামাজিক ও বিনিময় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভোক্তার অভাব পূরণ ও তাদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়।

বিপণনের মৌলিক ধারণা
Core Concepts of Marketing

ভোক্তাদের প্রয়োজন নির্ধারণ, সেইভাবে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন এবং ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বিধান হলো বিপণনের একমাত্র লক্ষ্য। বিপণন সম্পর্কে আলোচনার জন্য কতকগুলো ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই ধারণাসমূহ বিপণন সম্পর্কিত আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নিচে চিত্র ১.১ এর সাহায্যে বিপণনের মৌলিক ধারণাগুলো উপস্থাপন ও আলোচনা করা হলো–

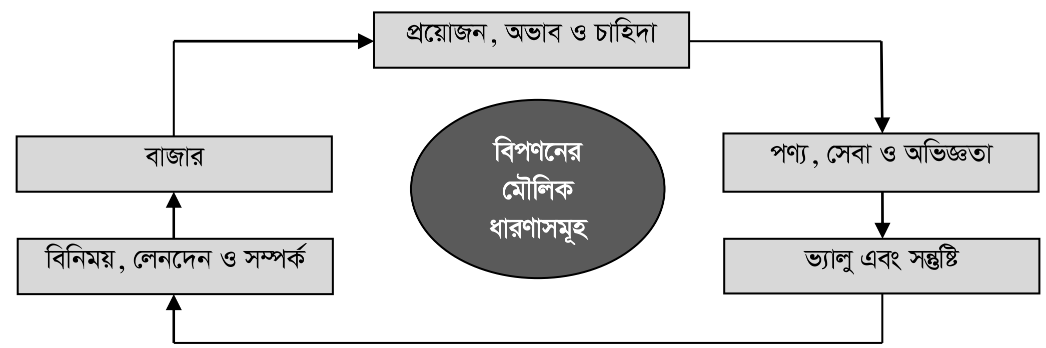

চিত্র ১.১: বিপণনের মৌলিক ধারণাসমূহ

১. **প্রয়োজন, অভাব ও চাহিদা (Needs, Wants and Demands):** দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আবশ্যকতা অনুভব করাকে *প্রয়োজন* বলে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, সেবা ইত্যাদি অপরিহার্য। যেমনঃ ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে আবার মানুষ নিরাপদে ও আরামের থাকার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন বোধ করে। মানুষের এই প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বিপণনের মৌলিক ধারণার শুরু হয়েছে।

সমাজ, সংস্কৃতি বা ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'প্রয়োজন' যখন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আকারে প্রকাশ পায় তখন তাকে *অভাব* বলে। মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন অনুভব করে। যেমনঃ বাংলাদেশি ক্রেতা খাদ্য হিসেবে ভাত, বিরিয়ানি ইত্যাদি আর আমেরিকান ক্রেতা বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বেশি পছন্দ করবে।

আবার, কোনো দ্রব্য বা সেবার অভাব থাকলে এবং সেটি ক্রয় করার জন্য অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলে তাকে *চাহিদা* বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো ভোক্তার বাসস্থানের অভাব রয়েছে, এ কারণে সে টিন, ইট অথবা কাঠ দিয়ে ঘর তৈরি করে তার বাসস্থানের অভাব পূরণ করতে পারে। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কোনো ভোক্তা যদি টিনের ঘর তৈরি করে, তখন তার নিকট টিনের চাহিদা রয়েছে। আবার অন্য কোনো ভোক্তার কাছে ইটের তৈরি অট্টালিকা বানানোর সামর্থ্য থাকলে তার কাছে ইটের চাহিদা রয়েছে।

২. **পণ্য, সেবা ও অভিজ্ঞতা (Products, Services and Experiences):** বিপণনকারী একগুচ্ছ সুবিধা (Bundle of benefits) প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতার প্রয়োজনকে পূরণ করে এবং বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করে। এই সুবিধাসমূহ পণ্য, সেবা, তথ্য, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমন্বয়ে রূপদান করে নির্দিষ্ট ক্রেতার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বাজারে উপস্থাপন করাকে *বিপণন অফার* (Marketing offerings) বলে।

বিপণন অফার দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান হতে পারে। ভোক্তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করতে পারে এমন দৃশ্যমান যা কিছু বাজারে বিক্রয়ের জন্য বিদ্যামান তাকে *পণ্য* বলে। খাতা, কলম, বই, চাল, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি দৃশ্যমান পণ্য। অন্যদিকে সেবা জাতীয় পণ্য হলো অদৃশ্যমান পণ্য, যা পাওয়ার জন্য ভোক্তা অর্থ বিনিময় করতে প্রস্তুত থাকে। যেমনঃ হোটেল, সেলুন, গাড়ি মেরামত, আইনজীবী, শিক্ষক, প্রকৌশলী, ডাক্তার ইত্যাদি গতানুগতিক সেবার সাথে বর্তমানে ইন্টারনেট (Internet), কুরিয়ার (Courier), হোম ডেলিভারি (Home delivery) সেবা ইত্যাদির প্রসার ঘটছে। বিভিন্ন সেবা এবং পণ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান *অভিজ্ঞতা (Experiences)* সৃষ্টির মাধ্যমে বিপণনের কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে। যেমন- উদ্যানে ভ্রমণ, পার্কে বেড়ানো ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যাপকভাবে, বিপণনকারী আরো অনেক বস্তু বা সত্তা বিপণন করতে পারে। বিপণনকারী সময়ভিত্তিক বিভিন্ন ইভেন্টস বা অনুষ্ঠান (Events) আয়োজন করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ক্রেতাদের নিকট প্রতিষ্ঠান, পণ্য বা সেবার সংবাদ পৌঁছে দিয়ে থাকে। যেমনঃ কোম্পানির বর্ষপূর্তি, ট্রেড শো, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, চিত্র প্রদর্শনী, ওপেন এয়ার কনসার্ট ইত্যাদি। বর্তমানে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত ব্যক্তিকে (Persons) কেন্দ্র করে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা, চিকিৎসক, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ তাদের খ্যাতি, পরিচিতি, নাম-যশ, সুনাম আকর্ষণ ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য বিপণনকারীর সাহায্য নিচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা বিশেষায়িত বিভিন্ন স্থানকে (Places) আকর্ষণীয় করে বিপণন করার জন্য কাজ করছে। যেমনঃ কক্সবাজার, সুন্দরবন ইত্যাদি। সম্পত্তির (Properties) ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে বিপণনের প্রায় সকল কাজই জড়িত। যেমনঃ জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, গাড়ি, শেয়ার, বন্ড, সুনাম ইত্যাদি। বর্তমানে প্রায় সকল সংগঠনই (Organizations) জনগণের মনে অনুকূল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে প্রচুর বিনিয়োগ করে। বিপণনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর, রোভার স্কাউট, লায়ন্স ক্লাব ইত্যাদি সংগঠনগুলো বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি করে। বিপণনের মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞান সৃষ্টি করে তা বিভিন্ন ভোক্তার কাছে সরবরাহ করা হয়। যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষায়িত সাময়িকী, টিভি-চ্যানেল ইত্যাদি তথ্য ও জ্ঞান ভোক্তার কাছে সরবরাহ করে। ধারণা

(Ideas) হলো এমন কিছু বক্তব্য, বার্তা বা বিশ্বাস যা বিপণনের কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তার আচরণ ও ব্যবহারে পরিবর্তন আনে, সচেতন করে এবং ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, প্লাস্টিক পণ্য পরিহার করুন, ট্রাফিক আইন মেনে চলুন, ধূমপানে বিষপান, গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান ইত্যাদি।

৩. **ক্রেতা ভ্যালু এবং সন্তুষ্টি (Customer Value and Satisfaction):** বিপণনে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় এবং ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতা যে উপকারিতা পায় এবং পণ্য বা সেবাটি অর্জনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তার পার্থক্যকে *ক্রেতা ভ্যালু* বলে। পণ্য বা সেবার মান, মূল্য, ব্র্যান্ড ইত্যাদির সমন্বয়ে ক্রেতা সেই পণ্য বা সেবা সম্পর্কে একটি মনোভাব ধারণ করে, এর ভিত্তিতে ক্রেতার ভ্যালু নির্ধারিত হয়।

ভোক্তা কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়ের সময় যেসব সুবিধা প্রত্যাশা করে, তার সাথে ব্যবহারের পর প্রাপ্ত সুবিধার তুলনা করে ভোক্তার মধ্যে যে আনন্দ বা নৈরাশ্যের অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাকে *সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি* বলে। ভোক্তা তার প্রত্যাশা অনুসারে পণ্য বা সেবা হতে সুবিধা পেলে সন্তুষ্ট হবে এবং না পেলে অসন্তুষ্ট হবে।

৪. **বিনিময়, লেনদেন এবং সম্পর্ক (Exchange, Transactions and Relationships):** কোনো কিছু প্রদানের মাধ্যমে অন্যের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত পণ্য লাভের উপায়কে বিনিময় বলে। যেমনঃ রহিম ও করিম একজন আরেকজনের সাথে দুইটি বই আদান-প্রদান করলো একে বিনিময় বলে। এখানে কোনো অর্থ বা মূল্যের সংশ্লিষ্টতা নেই। দু'টি পক্ষের মধ্যে মূল্য বা অর্থের মাধ্যমে কোনো বিনিময় সংঘটিত হওয়াকে লেনদেন বলে। যদি রহিম ১০০ টাকার বিনিময়ে বই বিক্রেতার কাছ থেকে একটি বই ক্রয় করে, তবে তাকে লেনদেন বলা হবে।

পণ্য বা সেবার বিনিময়ের সময় বিভিন্ন পক্ষ জড়িত থাকে। যেমন- ক্রেতা, ভোক্তা, বিক্রেতা, সরবরাহকারী, পরিবেশক ইত্যাদি। সম্পর্কভিত্তিক বিপণন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিপণনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পণ্য বা সেবার বিনিমিয়ের সাথে জড়িত পক্ষগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও রক্ষা করা হয়।

৫. **বাজার (Market):** বাজার বলতে বর্তমান ও সম্ভাব্য বা ভবিষ্যৎ ক্রেতার একটি সমষ্টিকে বোঝায়। ক্রেতা কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি হতে পারে, যাদের পণ্য বা সেবার প্রয়োজন থাকে এবং সেই পণ্য বা সেবা ক্রয়ের সামর্থ্য, ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব থাকে। অন্যদিকে, বিক্রেতা ক্রেতার প্রয়োজনানুসারে পণ্য উৎপাদন করে ও বাজারে সরবরাহ করে। এক কথায়, পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে সক্ষম এমন বর্তমান ক্রেতা এবং সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টিকে বাজার বলা যায়। সাধারণত বিপণন কর্মকাণ্ড বাজারকে লক্ষ করেই পরিচালিত হয়। যেমনঃ কোনো শিশু চকোলেট ক্রয় করলে চকোলেট পণ্যের সে বর্তমান ক্রেতা হিসেবে চকোলেট বাজারের অন্তর্গত। আবার শিশুটি বড় হয়ে ভবিষ্যতে কম্পিউটার ক্রয় করতে পারে বলে সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে সে কম্পিউটার বাজারের অন্তর্গত হতে পারে। বিপণন ব্যবস্থায় শিল্প (বিক্রেতাদের সমষ্টি) ও বাজার (ক্রেতাদের সমষ্টি) এ দুই পক্ষের মধ্যে অর্থের বিনিময়ে পণ্য বা সেবার আদান-প্রদান হয়। বাজারে প্রধানত দুই ধরনের ক্রেতা রয়েছে। প্রথমত, যেসব ক্রেতা শুধুই ভোগ করার উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করে তাদের সমন্বয়ে ভোক্তা বাজারের (Consumer Market) সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, যে সকল প্রতিষ্ঠান পুনরায় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বা শিল্প-কারখানায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয় করে তাদেরকে ব্যবসায় বাজার (Business Market) বলে। এছাড়াও রয়েছে বিশ্বব্যাপী বাজার (Global Market) এবং অমুনাফাভোগী ও সরকারি বাজার (Nonprofit and Government Market)।

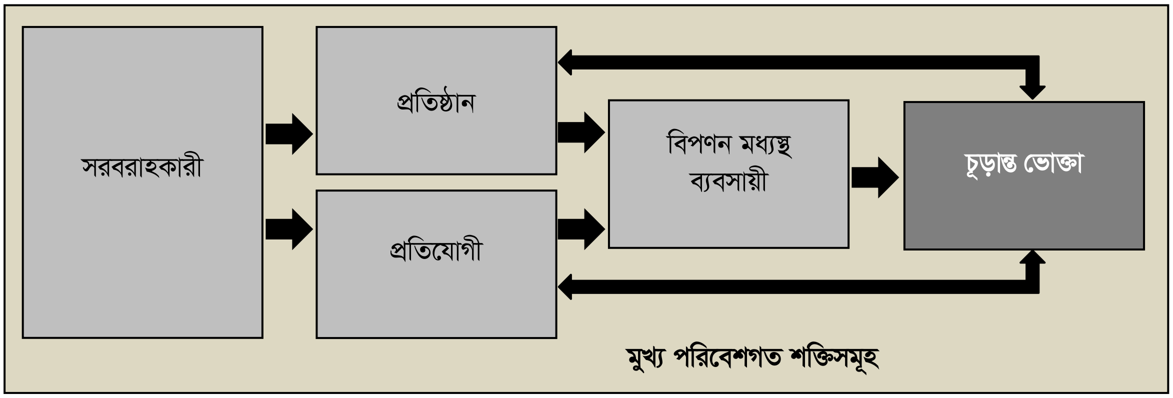

চিত্র ১.২: আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা

চিত্র ১.২-এর মাধ্যমে আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার মূল উপাদানগুলো দেখানো হয়েছে। পণ্য উৎপাদনের জন্য সরবরাহকারী প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নির্দিষ্ট বাজারের সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করে এবং এইসব কাঁচামাল ব্যবহার করে চূড়ান্ত পণ্য প্রস্তুত করে। পণ্য প্রস্তুত হওয়ার পর বিপণন মধ্যস্থ ব্যবসায়ী যেমনঃ পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, এজেন্ট ইত্যাদি পণ্য বা সেবা চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট উপস্থাপন, বিক্রয় বা সরবরাহ করে। বিপণনের এই কার্যক্রমে ব্যবসায় পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিসমূহ প্রভাব সৃষ্টি করে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল শক্তি যা বিপণন কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাকে বিপণন পরিবেশ বলে।

বিপণনের গুরুত্ব
Importance of Marketing

বিপণন ভোক্তার প্রয়োজন অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করে। এ জন্য বিপণনকারীগণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে। বিপণনকারীরা পণ্য সরবরাহ করার সাথে সাথে অনবরত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বিদ্যমান পণ্যের উন্নয়ন করে। একই সাথে বিপণনকারীরগণ ভোক্তার চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে যুগোপযোগী পণ্য বা সেবা প্রস্তুত ও সরবরাহ করে ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। বিপণন বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মানুষের সুপ্ত ও বিদ্যমান চাহিদাকে চিহ্নিত করে ও তা জাগ্রত করে এবং স্বত্বগত, স্থানগত, সময়গত ও রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে সমাজে পণ্য বা সেবার চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে।

বিপণনকারীরা দেশে ও বিদেশে পণ্যের চাহিদার বিভিন্নতা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে। বিপণন ব্যবস্থায় পণ্যের চাহিদা ও প্রয়োজনানুসারে সঠিক সময়ে সঠিক পণ্যটি, সঠিক স্থানে পৌঁছে দিয়ে পণ্যের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়। বাজারে কোন ধরণের পণ্য প্রয়োজন, কী পরিমাণ পণ্য প্রয়োজন এবং কখন এ পণ্যটি প্রয়োজন–এ বিষয়গুলো ছাড়াও পণ্য-দ্রব্যের সঠিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে বিপণন একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। সামগ্রিক বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের সাথে সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

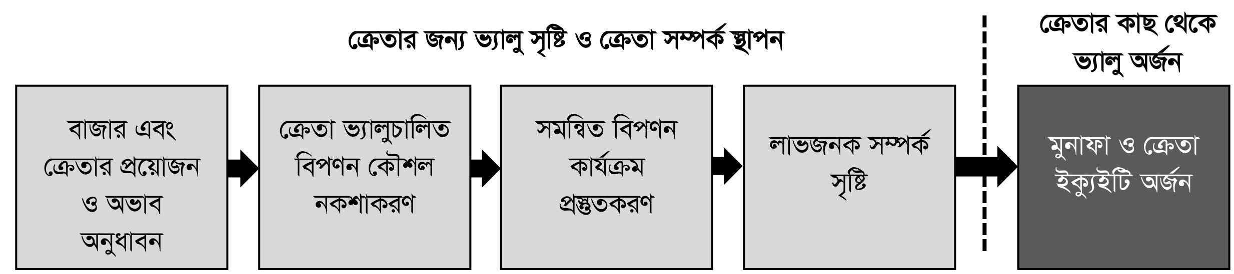

চিত্র ১.৩: বিপণন প্রক্রিয়া–ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি ও অর্জন

বিপণন প্রক্রিয়ায় (চিত্র নং ১.৩) প্রথমেই বাজার ও ক্রেতার প্রয়োজন সম্পর্কে জানার পর বিপণনকারী ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি করার জন্য বিপণন কৌশল কেমন হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। পরবর্তীতে, তারা বিপণন কার্যক্রম নির্ধারণ করে এবং ক্রেতা সম্পর্ক তৈরির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিপণন প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে ক্রেতা ভ্যালুচালিত বিপণন কৌশল নকশা করা (চিত্র নং ১.৩) যা এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। এরজন্য বিপণনকারীকে প্রথমত, ক্রেতা নির্বাচন; দ্বিতীয়ত, ভ্যালু প্রস্তাব মনোনয়ন এবং সর্বশেষে বিপণন ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট মতবাদ নির্ধারণ করতে হয়।

ক্রেতা ভ্যালুচালিত বিপণন কৌশল নকশাকরণ

Designing Customer Value-Driven Marketing Strategy

যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জন করার জন্য অর্থায়ন, পণ্য উৎপাদন, হিসাববিজ্ঞান ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সাথে সাথে বিপণনের কার্যক্রমও সম্পন্ন করতে হয়। কারণ বিপণন কার্যক্রম বাজারে পণ্য ও সেবার চাহিদা অনুসন্ধান করে এবং সে অনুযায়ী পণ্য তৈরি ও সরবরাহ করে। আর বিপণনের এই কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ওপর নির্ভর করছে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক সফলতা। বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিপণনের কার্যাবলি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

Philip Kotler & Gary Armstrong বিপণন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলেছেন-"Marketing management is the art and science of choosing target markets and building profitable relationships with them." অর্থাৎ বিপণন ব্যবস্থাপনা হচ্ছে লক্ষ্য বাজার পছন্দ করা এবং তাদের সাথে লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার কলা ও বিজ্ঞান। সুতরাং বলা যায় যে, বিপণন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই হলো বিপণন ব্যবস্থাপনা। বিপণন ব্যবস্থাপনা হলো ব্যবসায় সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সেই কার্যগত ক্ষেত্র যার মাধ্যমে উৎপাদকের কাছ থেকে দ্রব্য ও সেবা দক্ষতার সাথে সঠিক সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও মসৃণ প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য ক্রেতা (Target cutomers) বা ভোক্তার কাছে পৌঁছায়।

ক. ক্রেতা নির্বাচন (Selecting Customers): একজন বিপণনকারীর পক্ষে সকল বা সব ধরণের ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয় তাই বিপণনকারী লাভজনক ক্রেতা নির্বাচন করে। বিপণনকারী বাজার বিভক্তিকরণের মাধ্যমে লক্ষ্য ক্রেতাদের নির্বাচন করে বিপণন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। বিপণন ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে ক্রেতাদের চাহিদা সঠিকভাবে বিশ্লেষণের ওপর। ক্রেতারা কোন পণ্য, কখন, কোথা হতে, কী মূল্যে, কীভাবে পেতে চায় তা চাহিদা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়। সর্বোচ্চ ক্রেতা সন্তুষ্টি ও ভ্যালু প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ্য ক্রেতাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি ও শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব। এ জন্য বিপণন ব্যবস্থাপনা অপেক্ষাকৃত সম্ভাবনাময় লক্ষ্য বাজার অংশ নির্বাচন করে এবং তাদের সাথে শক্তিশালী ভ্যালু নির্ভর সম্পর্ক গড়ে তোলে। সুতরাং বিপণন ব্যবস্থাপনা হলো মূলত ক্রেতা ব্যবস্থাপনা ও ক্রেতার চাহিদা ব্যবস্থাপনা।

খ. ভ্যালু প্রস্তাব মনোনয়ন (Choosing a Value Proposition): বিপণনকারী লক্ষ্য ক্রেতাকে কীভাবে প্রতিযোগীদের থেকে আলাদাভাবে সন্তুষ্ট করবে এবং বাজারে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করবে এ ব্যাপারে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ জন্য বিপণনকারী প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য লাভজনকভাবে লক্ষ্য ক্রেতাকে ভ্যালু সরবরাহ করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের ভ্যালু প্রস্তাব বলতে সকল সুবিধা বা ভ্যালুসমূহকে বোঝায় যা ব্র্যান্ডটি ভোক্তাকে সরবরাহ করার জন্য

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। যেমন: ফেসবুক (Facebook) ভোক্তাকে 'পরিবার, বন্ধু ও কাছের মানুষদের সাথে যোগাযোগ ধরে রাখা'র জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফেসবুক তাই ভোক্তাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে টেক্সট বা ফোন করাসহ বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে ভ্যালু সরবরাহ করছে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে ক্রেতার সামনে বিভিন্ন পণ্য থেকে নিজের পছন্দমতো পণ্য ক্রয় করার স্বাধীনতা রয়েছে। তাই বিপণনকারী সঠিক ভ্যালু সৃষ্টি ও সরবরাহ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, যেন ক্রেতা তার পণ্যই পছন্দ করে এবং ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করতে পারে। বিপণনকারী কর্তৃক ভ্যালু সৃষ্টি ও সরবরাহ করার সময় প্রতিষ্ঠানের মৌলিক সামর্থ্য (Core competency) নির্ধারণ করতে হয় এবং এরপর সঠিক বিপণন কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

গ. বিপণন ব্যবস্থাপনার মতবাদসমূহ (Marketing Management Philosophies/Orientations): বিপণন ব্যবস্থাপনার কাজ হলো এমন একটি কৌশলের পরিকল্পনা করা যার মাধ্যমে লক্ষ্য ক্রেতার প্রয়োজন পূরণ করা যায় এবং দীর্ঘ মেয়াদে লাভজনক সম্পর্ক তৈরি করা যায়। এর জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট কোনো মতবাদ বা দর্শন অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। নিম্নোক্ত পাঁচটি মতবাদের যেকোনো মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান তার বিপণন কৌশলের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। চিত্র ১.৪-এ দেখানো হয়েছে ধারাবাহিকভাবে কীভাবে বিপণন ধারণার বিকাশ ঘটেছে।

১. **উৎপাদন মতবাদ (Production Concept):** ব্যবসায় ধারণা শুরু হবার পর উৎপাদন মতবাদই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল। বিক্রেতা এই মতবাদে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস ও বাজার সম্প্রসারণ করার জন্য সবসময়ই চেষ্টা করতে থাকে। এই উৎপাদন মতবাদের মূল কথা হচ্ছে ক্রেতারা এমন সব পণ্য পছন্দ করবে বা পণ্য ক্রয় করবে যার জোগান পর্যাপ্ত এবং ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- বাংলাদেশে WASA, Bangladesh railway-র কার্যক্রম। এই ক্ষেত্রে ক্রেতা বা ভোক্তার মতামত বা সন্তুষ্টি, প্রতিযোগীদের কার্যক্রমের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

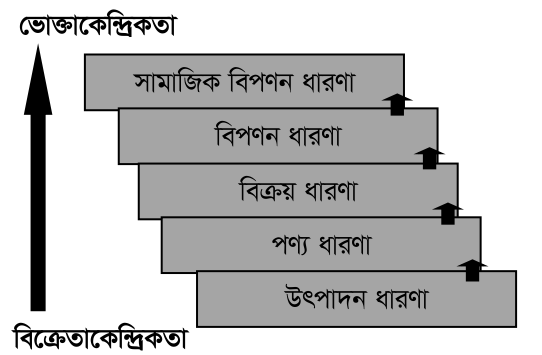

চিত্র ১.৪: বিপণন ব্যবস্থাপনার মতবাদসমূহ

২. **পণ্য মতবাদ (Product Concept):** পণ্য মতবাদে মনে করা হয় যে ক্রেতারা সেসব পণ্য পছন্দ করবে যেসব পণ্য গুণগত মানে উন্নত, কার্যকর ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। পণ্য মতবাদে অনুমান করা হয় যে ভোক্তা সবচেয়ে বেশি গুণসম্পন্ন, কার্যকর ও উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পণ্য পছন্দ করে আর সেই উৎকৃষ্টমানের পণ্য তৈরি করতে পারলেই পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়বে। যেমন: ঔষধ, দামি মোবাইল ফোন ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময়, বিপণনকারী ভোক্তার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে পণ্যের বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের উপর বেশি জোড় দিয়ে থাকে, এই পরিস্থিতিকে *অদূরদর্শী* বিপণন (Marketing myopia) বলা হয়। এর ফলে বিপণনকারী ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে।

চিত্র ১.৫: বিক্রয় মতবাদ ও বিপণন মতবাদের তুলনা

৩. **বিক্রয় মতবাদ (Selling Concept):** বিক্রয় মতবাদে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির কারা জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। এইসব কর্মপন্থা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা ক্রেতাদের প্ররোচিত করে অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করার জন্য। এ মতবাদের মূল কথা হলো অধিক বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন। এক্ষেত্রে বিপণনকারী পণ্য বিক্রয়ের জন্য যেসব প্রসারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে, তা হলো- বিজ্ঞাপন, প্রচার, বিক্রয় প্রসার, বিক্রয়কর্মী নিয়োগ ইত্যাদি। বাংলাদেশে ব্যাংক ও আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এ মতবাদ অনুসরণ করে।

৪. **বিপণন মতবাদ (Marketing Concept):** বিপণন মতবাদে মনে করা হয় যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন নির্ভর করে লক্ষ্য বাজারের প্রয়োজন ও অভাব নির্ধারণ এবং প্রতিযোগীদের তুলনায় কার্যকর ও দক্ষভাবে কাঙ্ক্ষিত পণ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করার ওপর। এই মতবাদে সমন্বিত বিপণন কর্মসূচি (পণ্য, মূল্য, বণ্টন ও প্রসার)-এর মাধ্যমে লক্ষ্য বাজারের সন্তুষ্টি বিধান করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় বিক্রয় ও বিপণনের কার্যক্রমকে একই ভাবা হয়। চিত্র ১.৫ এ বিক্রয় ও বিপণন মতবাদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো। বিপণন মতবাদে ভোক্তার রুচি-অরুচি, চাহিদা, মন-মানসিকতা, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে বিপণন কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং বিপণন মিশ্রণের রূপরেখা তৈরি করা হয়।

৫. **সামাজিক বিপণন মতবাদ (Societal Marketing Concept):** এই মতবাদে প্রধানত তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়, কোম্পানির মুনাফা, ভোক্তার সন্তুষ্টি এবং সমাজ ও জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ। ভোক্তা ও সমাজের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে বিপণন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো এ মতবাদ অনুসরণ করে চলেছে। বিভিন্ন কোম্পানি নানা প্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার উপর জোর দিচ্ছে কারণ তারা মানবিক মূল্যবোধকেও অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরিবেশগত সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি দূর করার জন্য কোম্পানিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চিত্র ১.৬-এ দেখানো হয়েছে সামাজিক বিপণন মতবাদ অনুসরণকারী বিপণনকারী ভোক্তা, কোম্পানি ও সমাজের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করছে।

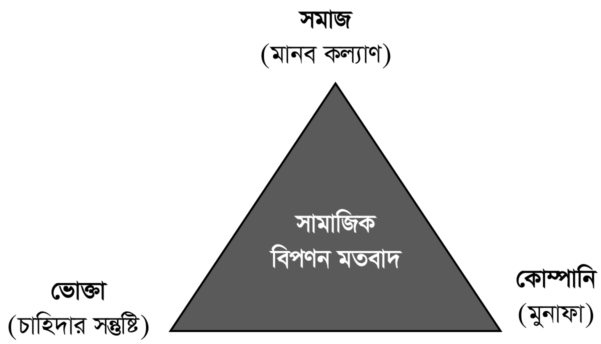

চিত্র ১.৬: সামাজিক বিপণন মতবাদ

সারসংক্ষেপ

বিপণন ক্রেতা সেবার একটি পরিবর্তনশীল ও জটিল বিষয়। অনেক সময়ই বিপণন বা মার্কেটিং দিয়ে শুধু ক্রয়-বিক্রয় বা প্রচারণা কার্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, বিপণন ক্রয়-বিক্রয় বা প্রচারণা ছাড়াও পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ, আকর্ষণীয় মোড়কীকরণ, মূল্য নির্ধারণ, পরিবহন, প্রসার ইত্যাদি কাজ করে। বিপণন কার্যাবলীতে ভোক্তার প্রয়োজন অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবা প্রস্তুতের ব্যাবস্থা করে। এ জন্য বিপণনকারীগণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে। বিপণন ব্যবস্থাপনা হলো ব্যবসায় সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সেই কার্যগত ক্ষেত্র, যার মাধ্যমে উৎপাদকের কাছ থেকে দ্রব্য ও সেবা দক্ষতার সাথে সঠিক সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও মসৃণ প্রক্রিয়ায় ক্রেতা বা ভোক্তার কাছে পৌঁছায়। বিপণন ব্যবস্থাপনার মতবাদসমূহ হলো–উৎপাদন মতবাদ, পণ্য মতবাদ, বিক্রয় মতবাদ, বিপণন মতবাদ ও সামাজিক বিপণন মতবাদ। বিপণন ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ হচ্ছে বিপণন কর্মকাণ্ডের কৌশল ও পরিকল্পনা উন্নয়ন করা। এছাড়াও এর অন্যতম কাজ হচ্ছে বিপণনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। বিপণন ব্যবস্থাপনা বাজার বিভক্তিকরণের মাধ্যমে লক্ষ্য ক্রেতাদের নির্বাচন করে বিপণন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

পাঠ-১.২ কৌশলগত বিপণনের সংজ্ঞা, কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি, কার্য ও ভিত্তিসমূহ
Definition, Nature, Tasks and Foundations of Strategic Marketing

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কৌশলগত বিপণনের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনার ভিত্তিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি ও কার্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন

কৌশলগত বিপণনের সংজ্ঞা
Definition of Strategic Marketing

কৌশলগত বিপণন হলো এমন একটি বিপণন কৌশল যেখানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ এবং উচ্চতর ক্রেতা ভ্যালু সরবরাহ করার জন্য নানামুখি বিপণন যুক্তি উপস্থানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। অর্থাৎ যে বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে ক্রেতাদের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে লক্ষ্যস্থিত বাজারে উন্নত ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় তাকে কৌশলগত বিপণন (Strategic Marketing) বলে। একটি ব্যবসায় ক্রেতাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কৌশলগত বিপণন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় যার মাধ্যমে পরিবর্তনশীল ব্যবসায় পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। একই সাথে বাজারমুখী কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নত ক্রেতা ভ্যালু সরবরাহের চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও কৌশলগত বিপণনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করা হয়, যা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনে সহায়তা করে। বিভিন্ন লেখক নানাভাবে কৌশলগত বিপণনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো-

Cravens & Piercy এর মতে, "Strategic marketing is a market-driven process of strategy development that considers a constantly changing environment and the need to deliver superior customer value." অর্থাৎ কৌশলগত বিপণন হচ্ছে কৌশল উন্নয়নের একটি বাজারমুখী প্রক্রিয়া যেক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তশীল পরিবেশ ও উচ্চতর ক্রেতা ভ্যালু সরবরাহের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করা হয়।

Musadiq A. Sahaf এর ভাষায়, "Strategic marketing deals, with such decisions in a company that call for an effective management of its marketing task with an objective to atain organizations wider objectives." অর্থাৎ কৌশলগত বিপণন একটি কোম্পানির ঐ সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে যা সংগঠনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিপণন কাজে কার্যকর ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে।

কৌশলগত বিপণনের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো-

- প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম হলো কৌশলগত বিপণন
- কৌশলগত বিপণনের মাধ্যমে ক্রেতামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়
- এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা নিরূপণ করা যায়
- কৌশলগত বিপণনে উচ্চত্তর ক্রেতা সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভোক্তাদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে বিপণন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সকল কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাকে কৌশলগত বিপণন বলে।

কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি ও কার্যসমূহ
Nature and Tasks of Strategic Marketing

মূলত ক্রেতাদের পরিবর্তিত চাহিদা পূরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাঙ্খিত ক্রেতাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টির প্রচেষ্টাই হলো কৌশলগত বিপণন। তাই বলা যায়, কৌশলগত বিপণন একটি সু-সমন্বিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিপণনকারীগণকে কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হয়। পরবর্তীতে তার প্রেক্ষিতে বিপণন পরিকল্পনা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হয়। এখানে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয় সেগুলো হলো-

১. **আমরা এখন কোথায় আছি (Where are we now?):** এখানে একটি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বাজার সুযোগ ও প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত অবস্থা চিহ্নিত করা এবং তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়।

২. **ভবিষ্যতে আমরা কোথায় যেতে চাই (Where do we want to go in future?):** এ স্তরে বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা হয়। অর্থাৎ এখানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মিশন-ভিশন স্থির করা হয়।

৩. **আমরা কীভাবে সেখানে যেতে পারি (How do we want to get there?):** এখানে উদ্দেশ্য, মিশন ও ভিশনের যথাযথ বাস্তবায়নের পথ খোঁজা হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

৪. **আমরা কীভাবে জানবো কখন সেখানে যেতে হবে? (How will we know when we get there?):** এ প্রশ্নের মাধ্যমে একজন বিপণনকারীর বিপণন কৌশল প্রয়োগের পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। এ স্তরে পূর্বের বিভিন্ন সূচকসমূহ বিবেচনা করে ভবিষ্যত গন্তব্যপথ নির্ধারণ ও তা মনিটরিং করা হয়। কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি ও কার্যসমূহ কার্যভিত্তিক বিপণন থেকে কিছুকটা আলাদা। নিম্নে চিত্র ১.৭-এ তা বর্ণনা করা হলো-

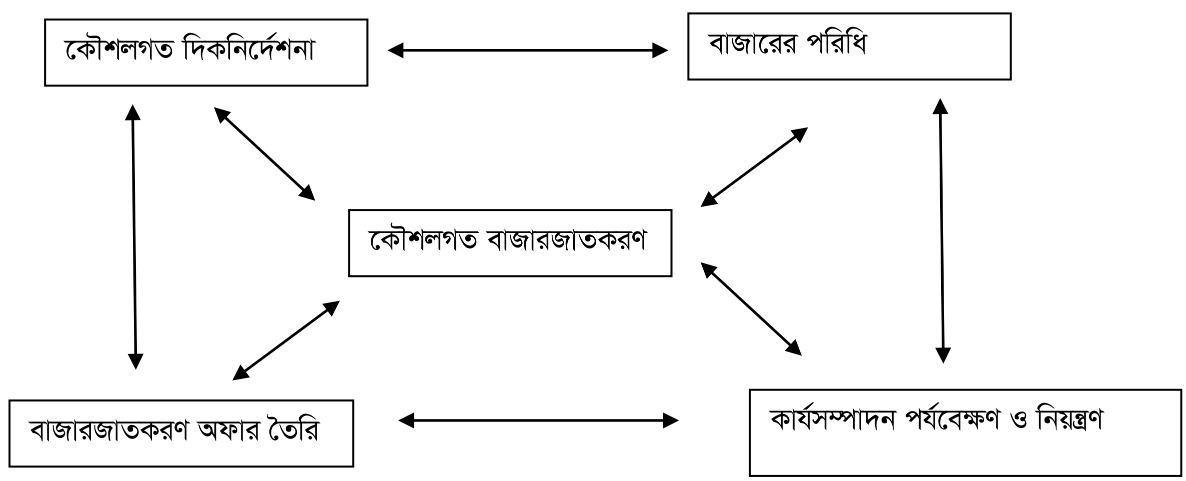

চিত্র ১.৭: কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি ও কার্যসমূহ

১. **কৌশলগত দিক নির্দেশনা (Strategic Direction):** কৌশলগত বিপণনের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য যথাযথ দিক নির্দেশনা ঠিক করা। প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে তার সাথে খাপ খাওয়াতে যুৎসই দিক নির্দেশনা প্রদানই কৌশলগত বিপণনের প্রধান কাজ।

২. **বাজার পরিধি (Market Scope):** কৌশলগত বিপণনের কাজ হলো বাজারের পরিধি নির্ধারণ। বাজারের পরিধি বলতে মূলত: বাজার বিভাগ, ক্রেতাদের সংখ্যা, ক্রেতাদের প্রয়োজন ও চাহিদা, কোম্পানী বা শিল্পের সংখ্যা ইত্যাদিকে বুঝায়। বাজার পরিধি ব্যাপক বা সংকীর্ণ উভয়ই হতে পারে। কৌশলগত বিপণন এ পরিধি নির্ধারণ পুর্বক সে মোতাবেক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

৩. **বাজার অর্পন তৈরি (Market offing formaulation):** লক্ষ্যস্থিত বাজারের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক পণ্য, সেবা ও অভিজ্ঞতা অর্পনের জন্য নকশা প্রণয়ন করা এবং প্রত্যাশিত সুবিধা চিহ্নিত করা কৌশলগত বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। কাজেই বাজাজরাতকারীকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিপণন অর্পন প্রণয়নের কাজটি করতে হয়।

৪. **কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ (Monitoring and Control of Performance):** কৌশলগত বিপণনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাজগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং উক্ত কাজের মধ্যে কোন প্রকার সমস্যা চিহ্নিত হলে তা সংশোধণের ব্যবস্থা করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠান কোথায় আছে, কোথায় যেতে চায়, কীভাবে যেতে পারে এবং যাওয়ার উপায় সম্পর্কে প্রথমে ভাবতে হয়। তারপর যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অর্থাৎ কৌশলগত বিপণন কৌশলগত ও বাস্তবায়নমুখি কর্মসূচী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনাকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি ও কাজের মাধ্যমে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়।

কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনার ভিত্তিসমূহ

Foundations of Strategic Marketing Management

কৌশলগত বিপণন হলো এমন একটি যুক্তি যেখানে কোম্পানিগুলো সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। এ বিপণন পদ্ধতি কৌশলগত ও বাস্তবায়নমুখি কর্মসূচী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনাকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনার কিছু ভিত্তি বা সিদ্ধান্ত রয়েছে যা ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা সহায়তা করে থাকে। সমস্যা সমাধানের এ বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার ধাপগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক তা নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. **বিশ্লেষণ (Analysis):** কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মিশন-ভিশন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণের জন্য যে সকল প্রশ্নের উত্তর জানার দরকার হয়, সেগুলো হলো-
   - ➢ সামগ্রিক বিপণন পরিবেশের উপাদানের মধ্যে কোথায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন?
   - ➢ যদি পরিবর্তন আনা হয়, তবে তা প্রতিষ্ঠান ও এর কার্যক্রমের উপর কীভাবে প্রভাব সৃষ্টি করবে?
   - ➢ উক্ত পরিবর্তনের জন্য সাংগঠনিক সম্পদের কতটুকু ব্যবহার করা প্রয়োজন?
   - ➢ প্রতিষ্ঠান কোন দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জন করে?

২. **পছন্দকরণ (Choose):** এ স্তরে বিভিন্ন বিকল্প প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে পছন্দকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য সুর্নিদিষ্ট কৌশল পছন্দ করা যায়। একটি প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো বিকল্প উপাদান থাকে যার মধ্য হতে সবচে' সঠিক বিকল্পটি এ স্তরে বাছাই করা হয়। এক্ষেত্রে পছন্দকরণের দিকগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-
   - ➢ কতিপয় কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।
   - ➢ ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কযুক্ত শক্তির উপর প্রভাব সৃষ্টি হয় যা প্রতিষ্ঠানের দূর্বলতাগুলো খুঁজে বের করে তা দূর করার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
   - ➢ পছন্দকরণের কৌশল নির্বাচনের মাধ্যমে সাংগঠনিক পরিবেশের সুযোগগুলো সীমিত করে, যা প্রতিযোগীদের হুমকি মোকাবেলায় সহায়তা করে থাকে।

৩. **বাস্তবায়ন (Implementation):** কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরগুলো পছন্দ করার পর সেগুলোর বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তগুলোকে

কাজে পরিণত করা হয়, যার মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা সহজ হয়। এছাড়া কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সু-সম্পন্ন করার জন্য সম্পদসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টনেরও ব্যবস্থা করতে হয়। এ পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে মিল রেখে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। এতে করে কাজের কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা যায়। সেই সাথে বিপনন সংক্রান্ত নানা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণও দেওয়া যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠান কোথায় আছে, কোথায় যেতে চায়, কীভাবে যেতে পারে এবং যাওয়ার উপায় সম্পর্কে প্রথমে ভাবতে হয়। তারপর যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অর্থাৎ কৌশলগত বিপণন কৌশলগত ও বাস্তবায়নমুখি কর্মসূচী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনাকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

যে বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে ক্রেতাদের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে লক্ষ্যস্থিত বাজারে উন্নত ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় তাকে কৌশলগত বিপণন (Strategic Marketing) বলে। একটি ব্যবসায় ক্রেতাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কৌশলগত বিপণন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় যার মাধ্যমে পরিবর্তনশীল ব্যবসায় পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। কৌশলগত বিপণন একটি সু-সমন্বিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিপণনকারীগণকে কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হয়। পরবর্তীতে তার প্রেক্ষিতে বিপণন পরিকল্পনা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হয়। কৌশলগত বিপণন ব্যবস্থাপনার কিছু ভিত্তি বা সিদ্ধান্ত রয়েছে যা ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা সহায়তা করে থাকে। সমস্যা সমাধানের এ বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাঠ ১.৩ বাজার পরিচিতিকরণ, বাজার পরিচিতিকরণের সুবিধা ও বাজারমুখি কৌশলসমূহ

Marketing Orientation, Characteristics and Advantages of Market Orientation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিপণন পরিচিতিকরণ কী তা বলতে পারবেন
- বাজার পরিচিতিকরণের বৈশিষ্ট্য সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বাজার পরিচিতিকরণের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন

বিপণন পরিচিতিকরণ

Marketing Orientation

কৌশলগত বিপণনের অন্যতম এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিপণন পরিচিতিকরণ। এক কথায়, কাঙ্খিত ভোক্তাদের পছন্দ, রুচি, চাহিদা এবং আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যম হলো বিপণন পরিচিতিকরণ। যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিপণন কার্যাবলি পরিচালনা করা হয় মূলত ভোক্তাদের জন্য। ভোক্তারা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রী ভোগ বা ব্যবহার না করে তবে সে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাফল্য অর্জন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই ভোক্তাদের প্রয়োজন মাফিক পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্যই প্রতিষ্ঠানকে বিপণন পরিচিতিকরণের প্রয়োজন পড়ে।

বিপণনে বাজার বলতে মূলত কোন পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যত ক্রেতার সমষ্টিকে বুঝায়। আর বাজার পরিচিতিকরণ হলো ক্রেতাকে পরিচিতিকরণ। আর বিপণন পরিচিতিকরণ হলো ক্রেতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তাদের প্রয়োজন ও চাহিদামত পণ্য বা সেবাসামগ্রী অফার করা। তাই বলা যায়, বিপণন পরিচিতিকরণ হচ্ছে এমন একটি ব্যবসায়িক মডেল যেখানে ক্রেতাদের আকাঙ্খা, চাহিদা এবং প্রয়োজন মাফিক পণ্যদ্রব্য সরবরাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ীরা টিকে থাকার জন্য বাজাজরাতকরণ পরিচিতিকরণ ব্যাপক হারে ব্যবহার করেন।

বিপণনকারীগণ এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রেতাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে পারে এবং তা সমাধানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করতে চেষ্টা করে। বিপণন পরিচিতকরণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো-

- ✓ এটি একটি ব্যবসায়িক মডেল
- ✓ এটি একটি ক্রেতাকেন্দ্রীক প্রক্রিয়া
- ✓ এখানে সর্বোচ্চ ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি হয়
- ✓ এটি একটি সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া
- ✓ এটি প্রতিযোগীদের বুদ্ধিমত্তা হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, বিপণনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্রেতার জন্য সর্বোচ্চ ভ্যালু সৃষ্টিই বিপণন পরিচিতিকরণ।

বাজার পরিচিতিকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ

Characteristics of Market Orientation

ভোক্তাদের পছন্দ, রুচি, চাহিদা এবং আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যম হলো বিপণন পরিচিতিকরণ। বাজার পরিচিতির মাধ্যমে ক্রেতাদের সর্বোচ্চ ভ্যালু প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কীভাবে ক্রেতা, প্রতিযোগী এবং বাজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ক্রেতাদের ভ্যালু প্রদান করা হয় তা বাজার পরিচিতিকরণের মধ্যে আলোচনা করা হয়। বাজার পরিচিতিকরণের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো-

১. **ব্যবসায়িক মডেল (Business Model):** বাজার পরিচিতিকরণকে ব্যবসায়িক মডেলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ এর মাধ্যমে ক্রেতাদের রুচি, প্রয়োজন, চাহিদা, আকাঙ্খা, ইত্যাদি নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ক্রেতা সেবা প্রদান করা হয়।

২. **ক্রেতাকেন্দ্রিক (Customer focus):** বাজার পরিচিতিকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি ক্রেতাকেন্দ্রিক। কারণ এর যাবতীয় কার্যাবলী ক্রেতাদের পছন্দকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদন করা হয়। এখানে প্রতিষ্ঠানগুলো কাঙ্খিত ক্রেতাদের চাহিদাকে বিবেচনা করে সে অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রেতাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে যাবতীয় কাজ সম্পাদিত হওয়ার কারণেই বাজার পরিচিতিকরণের কার্যক্রমকে ক্রেতাকেন্দ্রিক বলা হয়েছে।

৩. **প্রতিযোগীর বুদ্ধিসত্ত্বা (Competitor's Intelligence):** বাজার পরিচিতিকরণ প্রতিষ্ঠানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা প্রতিযোগীর বুদ্দিমত্তা বা কৌশল জানার চেষ্টা করে। কারণ প্রতিযোগীদের কৌশলসমূহ না জেনে কোন প্রতিষ্ঠান পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করলে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। প্রতিযোগীদের বিষয়ে গবেষণা করলে তাদের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে জানা যায়, যা বাজার পরিচিতিকরণ প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনে সহায়তা করে।

৪. **সমন্বয় সাধন (Co-ordination):** একটি প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়, যা বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। এর ফলে ক্রেতাদের জন্য সবগুলো বিভাগ নিয়ে কার্য পরিচালনা করা সহজতর হয়। কারণ বিভিন্ন ধরণের বাঁধা দূর করতে এই ধরনের সংগঠনগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও বাজার পরিচিতিকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৫. **ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি (Create Customer Value):** ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত সুবিধা এবং ব্যয়িত অর্থের পার্থক্যকে ক্রেতা ভ্যালু বলে। বাজার পরিচিতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ক্রেতাকেন্দ্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে যেহেতু ভোক্তার পছন্দকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় সেহেতু এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ক্রেতাদের জন্য সর্বোচ্চ ভ্যালু প্রদানের চেষ্টা করে যা এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাজার পরিচিতিকরণ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত সকল কাজই এদের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

বাজার পরিচিতিকরণের সুবিধা

The Advantages of Market Orientation

কৌশলগত বিপণনের অন্যতম এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজার পরিচিতিকরণ। কাঙ্খিত ভোক্তাদের রুচি, চাহিদা এবং আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যম হলো বিপণন পরিচিতিকরণ (Marketing Orientation) । ক্রেতাদের প্রয়োজন, রুচি ও চাহিদা মোতাবেক বিপণন কর্মসূচী প্রণয়ন হলো বাজার পরিচিতিকরণের প্রাথমিক কাজ। এক্ষেত্রে বিপণনের বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. **উত্তম বিপণন কর্মসূচী (Better Marketing Programs):** বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে জেনে তা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বাজার পরিচিতি উক্ত বিপণন কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে।

২. **ক্রেতা ক্রেন্দ্রিকতা (Customer Focus): বাজার পরিচিতিকরণে** ক্রেতাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে যাবতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। কাজের এ প্রক্রিয়াকে ক্রেতা ক্রেন্দ্রীকতা বলা যায়। অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদা পরিমাপ করে সে অনুযায়ী কাজ করে বলে এটি ক্রেতাকেন্দ্রীক হয়।

৩. **শক্তিশালী সম্পর্ক সৃষ্টি (Strong Relationship):** বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্রেতার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়। কারণ এ প্রক্রিয়ায় ক্রেতার চাহিদা পূরণে প্রতিষ্ঠান সর্বদা চেষ্টা করে থাকে। ফলে বিপণনকারী যেমন ক্রেতাকে জানতে পারে তেমনি ক্রেতারাও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুকূল ধারণা পায়।

৪. **অনুগত ক্রেতা সৃষ্টি (Creating loyal Customers):** বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে ক্রেতার অভাব মোচনের চেষ্টা করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুগত ক্রেতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। ক্রেতারা অনুগত হলে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৫. **ক্রেতার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি (Increase Customers Stability):** বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে ক্রেতার মনোভাব বুঝে তা পূরণের চেষ্টা করা হয় বিধায় শক্তিশালী ও স্থায়ী ক্রেতার সৃষ্টি হয়। কাজেই শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৬. **প্রতিযোগীতামূলক সুবিধা অর্জন (Achievement of Competitive Advantages):** বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে আরেকটি বড় যে সুবিধা পাওয়া যায় তা হলো প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন। এক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের তুলনায় কাঙ্ক্ষিত ক্রেতাদেরকে অপেক্ষাকৃত বেশী সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে উত্তম বিপণন কর্মসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। এতে করে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ও শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এতে দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জিত হয়। এভাবে বিপণনে সুবিধা পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

কৌশলগত বিপণনের অন্যতম এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিপণন পরিচিতিকরণ। এক কথায়, কাঙ্খিত ভোক্তাদের পছন্দ, রুচি, চাহিদা এবং আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যম হলো বিপণন পরিচিতিকরণ। যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিপণন কার্যাবলি পরিচালনা করা হয় মূলত ভোক্তাদের জন্য। ভোক্তারা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রী ভোগ বা ব্যবহার না করে তবে সে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাফল্য অর্জন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। ক্রেতাদের প্রয়োজন, রুচি ও চাহিদা মোতাবেক বিপণন কর্মসূচী প্রণয়ন হলো বাজার পরিচিতিকরণের প্রাথমিক কাজ। বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে উত্তম বিপণন কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ও শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্ক সৃষ্টি, এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জিত হয়।

পাঠ-১.৪ বাজারমুখী বিপণন কৌশলের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, ক্রেতা ভ্যালু এবং ক্রেতা ভ্যালু প্রদানের উপায়সমূহ
Definition & Characteristics of Market-Driven Strategies, Customer Value, and the way to Delivery Customer Value

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাজারমুখী বিপণনের সংজ্ঞা জানতে পারবেন
- বাজারমুখী কৌশলের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ক্রেতা ভ্যালু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ক্রেতা ভ্যালু অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বাজারমুখী কৌশলের সংজ্ঞা
Definition of Market-Driven Strategies

বৈশ্বিক পরিবর্তন, তীব্র প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে ক্রেতার প্রত্যক্ষণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে যা অনুধাবন করা প্রতিষ্ঠানের জন্য জটিল। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের সাথে ক্রেতা, প্রতিযোগী ও কোম্পানি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নকে বাজারমুখী কৌশল বলে। বাজারমুখী কৌশলের মাধ্যমে সাংগঠনিক কর্যক্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যায় যা ক্রেতাদের ভ্যালু প্রদান করতে সহায়তা করে। তাই বলা যায়- ক্রেতাদের মাঝে ভ্যালু সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তারকারী সাংগঠনিক কার্যক্রম ও প্রক্রিয়ার ফলপ্রসূ সংযোগকে বাজারমুখী কৌশল বলে। এ প্রসঙ্গে-

Philip Kotler & Gary Armstrong বলেন, “A market driven strategy is the planning and deployment of business resources to achieve a central set of objectives through a contanouously changing set of circumtstances.” ‘অর্থাৎ, বাজারমুখী কৌশল বলতে নিয়মিত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য ব্যবসায় সম্পদের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ব্যবহার করাকে বোঝায়।’

প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের সাথে ক্রেতা, প্রতিযোগী ও কোম্পানী সংশ্লিষ্ট উন্নয়নকে বাজারমুখী কৌশল বলে। একজন বিপণনকারী বাজারমুখী কৌশল প্রণয়নে যে সকল বিষয় বিবেচনা করে তা হলো-

- ✓ ক্রেতা, প্রতিযোগী এবং বর্তমান বাজার পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা
- ✓ সংগৃহীত তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করা
- ✓ সংগৃহীত তথ্য থেকে ক্রেতাদের সর্বোত্তম ভ্যালু প্রদানের উপায় সম্পর্কে গবেষণা করা
- ✓ প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের সাথে ক্রেতাদের প্রদানকৃত ভ্যালুর মিল করা
- ✓ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ক্রেতার ভ্যালু বিষয়টি নির্ধারণ করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্রেতা-বিক্রেতার পরস্পর সংশ্লেষের মাধ্যমেই মূলত বাজার সৃষ্টি হয়। আর ক্রেতারাই হলো রাজা। কাজেই প্রতিষ্ঠানকে বাজারকেন্দ্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। এরূপ কর্মসূচির পরিকল্পিত উপায় নির্ধারণকে বাজারমুখী কৌশল বলে। বাজারমুখী কৌশল গ্রহণের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে সামর্থ্যবান হবে।

বাজারমুখী বিপণন কৌশলের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Market- Driven Strategies

ক্রেতাদের নিয়ে গঠিত বাজারের ব্যবসায় কৌশলকে বাজারমুখী কৌশল বলে। যা প্রতিযোগীতামূলক সুবিধা অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে। বাজারমুখী কৌশল কতগুলো বৈশিষ্ট্য বহন করে যা নিচে চিত্রসহ আলোচনা করা হলো:

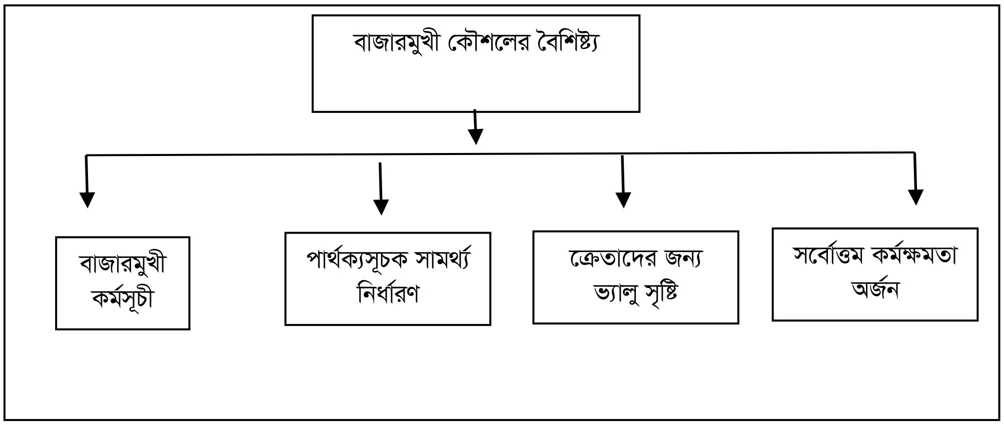

চিত্র: বাজারমুখী কৌশলের বৈশিষ্ট্য

১. বাজারমুখী হওয়া (Becoming Market Oriented): বাজারমুখী কৌশলের মাধ্যমে ব্যবসায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। বাজারমুখী কৌশলের মাধমে ক্রেতাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হয়। আর ক্রেতাদের চাহিদা পরিমাপ করে প্রয়োজন পূরণে বাজারমুখী কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করতে সহায়তা করে। তাই বলা যায়, বাজারমুখী কৌশলের মাধ্যমে বাজারমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যা দীর্ঘমেয়াদে কার্য পরিচালনা সহায়তা করে।

২. পার্থক্যসূচক সামর্থ্য নির্ধারণ (Determining distinctive capabilities): বাজারমুখী কৌশলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো পার্থক্যসূচক সামর্থ্য নির্ধারণ করা। পার্থক্যসূচক সামর্থ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তাদের কাজের সমন্বয় ও সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। অন্যান্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কাজের গতি তরান্বিত করে, ক্রেতাদের প্রয়োজন পূরণে দক্ষতা প্রয়োগ করে এবং উন্নতমানের পণ্য ও সেবা অফারের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় সাধন করার জন্য বাজারমুখী কৌশল কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৩. ক্রেতাদের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি (Creating Value for Customers): ক্রেতাদের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করা বাজারমুখী কৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্রেতাদের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করা প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয়। কোম্পানি বিভিন্নভাবে ক্রেতাদের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করে যেমন- পণ্য পৃথকীকরণ, দক্ষ বণ্টন প্রণালী এবং স্বল্প দামে পণ্য প্রদানের ব্যবস্থা উত্যাদি। আর এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাজারমুখী কৌশলের যথাযথ প্রয়োগ বাধ্যতামূলক।

৪. সর্বোত্তম কর্মদক্ষতা অর্জন (Achieving Superior Performance): বাজারমুখী কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ পরিচালিত হলে তা প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা অর্জনের সহায়ক হয়। অর্থাৎ বাজারমুখী কৌশলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সর্বোত্তমভাবে তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের ধরণ এবং উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরের কাজগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বাজারমুখী কৌশল ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে। অর্থাৎ বাজারমুখী কৌশলের দ্বারা সম্পাদিত কাজগুলোই মূলত এর বৈশিষ্ট্য বহন করে।

ক্রেতা ভ্যালু

Customer Value

কোন পণ্য বা সেবা ভোগ বা ব্যবহার করে ক্রেতা যে সুবিধা পায় এবং ঐ পণ্য বা সেবা ব্যবহারের জন্য যে অর্থ ব্যয় করতে হয়, এ দু'য়ের পার্থক্যকে ক্রেতা ভ্যালু বলে। অর্থাৎ ক্রেতা ভ্যালু হলো পণ্য বা সেবা থেকে প্রাপ্ত সুবিধা এবং এর জন্য ব্যয়িত অর্থের পার্থক্যের অনুপাত।

এ প্রসঙ্গে Philip Kotler & Gary Armstrong বলেন, "Customer value is the difference between the value the customer gains from owning and using a product and the cost of obtaining the product." অর্থাৎ পণ্য অর্জন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতার অর্জিত ভ্যালু এবং উক্ত পণ্য অর্জনের জন্য ব্যয়ের পার্থক্যই হলো ক্রেতা ভ্যালু।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন ক্রেতা বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি মোবাইল ফোন ক্রয় করলেন। ফোনটিতে ঐ ক্রেতার প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নত ক্যামেরা, ইন্টারনেট সুবিধা, হেড ফোন, ভালো মানের ব্যাটারী এবং আধূনিক ডিজাইন রয়েছে। তাহলে ঐ ক্রেতার প্রত্যাশিত সুবিধার সাথে বিশ হাজার টাকার পার্থক্যই হলো উক্ত ক্রেতা ভ্যালু। তাহলে বলা যায় যে, ক্রেতা ভ্যালু = পণ্য বা সেবার মান বা সুবিধা-বিনিময় মূল্য।

ক্রেতা ভ্যালু প্রদানের উপায়

The way to Delivery Customer Value

প্রতিষ্ঠান নানাভাবে ক্রেতা ভ্যালু (Customer Value) প্রদান করতে পারে। ক্রেতা ভ্যালুর উপর নির্ভর করে ক্রেতা সন্তুষ্টি (Customer satisfaction)। ক্রেতা সন্তুষ্টি হলো একজন ক্রেতার আনন্দ বা হতাশা যা পণ্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে উপলব্ধির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ক্রেতা ভ্যালু প্রদান করার কয়েকটি উপায় হলো-

১. **সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য সরবরাহ (Provide the best Product):** মানসম্পন্ন পণ্য ক্রেতার সন্তুষ্টি বাড়ায়। মানসম্পন্ন পণ্যের জন্য ক্রেতা অধিক মূল্য প্রদান করতে পাগ্রহী থাকে। তাই ভালো মানের পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতা ভ্যালু প্রদান করা যায়।

২. **সর্বোচ্চমানের সেবা প্রদান (Provide the best Service):** ক্রেতা ভ্যালু প্রদানের আরেকটি উপায় হলো ভালোমানের সেবা প্রদান । বিক্রয়োত্তর সেবা, গ্যারান্টি-ওয়ারেন্টি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

৩. **যথাযথ মূল্য নির্ধারণ (Provide Resoanble Cost):** অধিক মুনফা না করে উপযুক্ত বা যথাযথ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে ক্রেতা ভ্যালু অর্জন করা যায়।

সারসংক্ষেপ

বৈশ্বিক পরিবর্তন, তীব্র প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে ক্রেতার প্রত্যক্ষণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে যা অনুধাবন করা প্রতিষ্ঠানের জন্য জটিল। তাই মূলত কোম্পানিগুলো বাজারমুখী কৌশলের প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করছে। বাজারমুখী কৌশলের মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যায় যা ক্রেতাদের ভ্যালু প্রদান করতে সহায়তা করে। তাই ক্রেতাদের নিয়ে গঠিত বাজারের ব্যবসায় কৌশলকে বাজারমুখী কৌশল বলে। যা প্রতিযোগীতামূলক সুবিধা অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে। কোন পণ্য বা সেবা ভোগ বা ব্যবহার করে ক্রেতা যে সুবিধা পায় এবং ঐ পণ্য বা সেবা ব্যবহারের জন্য যে অর্থ ব্যয় করতে হয় এ দু'য়ের পার্থক্যকে ক্রেতা ভ্যালু বলে। অর্থাৎ ক্রেতা ভ্যালু হলো পণ্য বা সেবা থেকে প্রাপ্ত সুবিধা এবং এর জন্য ব্যয়িত অর্থের পার্থক্যের অনুপাত।

পাঠ-১.৫ ক্রেতামুখী বিপণন কৌশল, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য

Degigning a Customer-Driven Marketing Strategy, Difference between Strategic Planning and Marketing Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ক্রেতামুখী বিপণন কৌশল কীভাবে প্রণয়ন করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন।

ক্রেতামুখী বিপণন কৌশল প্রণয়ন

Degigning a Customer-Driven Marketing Strategy

কোন পণ্য বা সেবার বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতার সেটকেই বাজার বলে। তাই বলা যায়, বাজারমুখী কৌশল হলো ক্রেতামুখী কৌশল। প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের সাথে ক্রেতা, প্রতিযোগী ও কোম্পানি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নকেই বাজারমুখী কৌশল বলা যেতে পারে। প্রযুক্তির উন্নয়ন, তীব্র প্রতিযোগিতা, ক্রেতার প্রত্যাশা, ইত্যাদির ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। কাজেই কোম্পানীগুলো বাজারমুখী কৌশল গ্রহণে অধিক মনোযোগী হচ্ছে।

প্রখ্যাত লেখক Philip Kotler & Gary Armstrong এর মতে, "A market driven Strategy is the planning and development of business resources to achieve a central set of objectives through a continuously changing set of circumstances." অর্থাৎ বাজারমুখী কৌশল হলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবসায়ের সম্পদের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। তাহলে বলা যায় যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রেতাদের মাঝে ভ্যালু সৃষ্টিতে প্রভাববিস্তারকারী সাংগঠনিক কার্যক্রম ও প্রক্রিয়ার ফলপ্রসু সংযোগকেই বাজারমুখী কৌশল বলে।

ক্রেতার প্রয়োজন, অভাব, চাহিদা ও রুচির প্রতি খেয়াল রেখে অর্থাৎ ক্রেতার মানসিক অবস্থা বুঝে তার মনের ভিতর প্রবেশ করাই হলো ক্রেতামুখী বাজারজাতরকণ কৌশল। এটাই মূলতঃ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার কাজ। বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে Philip Kotler & Gary Armstrong বলেন, "Marketing management is the science and arts of choosing target markets and building profitable relationship with them." অর্থাৎ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা বলতে অভীষ্ট বাজার পছন্দকরণ এবং তাদের সাথে লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার কলা ও বিজ্ঞানকে বুঝায়।

ক্রেতামুখী বিপণন কৌশল প্রণয়ণ প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদান করার উপযোগী ক্রেতা বা ক্রেতাগোষ্ঠীকে পছন্দ করে তাদেরকে সেবাদানের জন্য তাদের মনে অবস্থান নেয়া (positioning), তাদের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করা এবং লাভজনক সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এ লক্ষ্যে বিপণন ব্যবস্থাপককে নিম্নের দু"টি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হয়:

i. কোন ধরণের ক্রেতাকে সেবা প্রদান করতে হবে? অর্থাৎ অভীষ্ট ক্রেতা কারা?
ii. কীভাবে ক্রেতাদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করা হবে? অর্থাৎ ক্রেতাভ্যালু কী হবে?

ক্রেতামুখী বিপণন কৌশল প্রণয়ন সম্পর্কে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা যায়-

১. **সেবা প্রদানের জন্য ক্রেতা নির্বাচন (Selecting Customers to Serve):** এ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সামর্থ্য বিবেচনায় এক বা একাধিক ক্রেতা বা ক্রেতাগোষ্ঠিকে সেবা প্রদানের জন্য নির্বাচন করতে পারে। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে অভীষ্ট ক্রেতা নির্বাচন বেশ জটিল কাজ। আবার সবশ্রেণীর ক্রেতাকে সেবা প্রদান করাও একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রতিষ্ঠানকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী অভীষ্ট

ক্রেতাদের স্তর (Level), প্রকৃতি (Nature), রুচি (Taste) এবং চাহিদা (Demand) সম্পর্কে জেনে সে অনুযায়ী ভ্যালু তৈরি এবং সেবা সরবরাহ করতে হবে।

২. **ভ্যালু প্রস্তাব পছন্দকরণ (Choosing a value proposition):** এ পর্যায়ে অভীষ্ট ক্রেতাদের জন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পার্থক্যসূচক এক বা একাধিক ভ্যালু প্রস্তাব অঙ্গীকার করতে হবে।
এ প্রসঙ্গে Philip Kotler & Gary Armstrong বলেন, "A company's value proposition is the set of benefits or values it promises to customers to satisfy their needs." অর্থাৎ ভ্যালু প্রস্তাব বলতে একগুচ্ছ সুবিধা বা ভ্যালুকে বুঝায় যার দ্বারা ভোক্তাদের প্রয়োজনগুলো সন্তোষজনক উপায়ে সমাধান করা যায়।

৩. **বাজার ব্যবস্থাপনা পরিচিতি (Marketing Management Orientation):** ক্রেতামুখী বিপণন কৌশল প্রণয়নের এ পর্যায়ে ক্রেতাদের সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী মুনাফাযোগ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। এখানে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠান কাকে বেশি গুরুত্ব দিবে-ক্রেতা, প্রতিষ্ঠান, নাকি সমাজকে? অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের দর্শন কী হবে? প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় রেখে যে কোন এক বা একাধিক মতবাদ বেছে নিতে পারে। এক্ষেত্রে পাঁচটি বিকল্প মতবাদ আছে। সেগুলো হলো-উৎপাদন মতবাদ, পণ্য মতবাদ, বিক্রয় মতবাদ, বিপণন মতবাদ এবং সামাজিক বিপণন মতবাদ।

কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য

Difference between Strategic Planning and Marketing Planning

পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যতে কী করা হবে তা আগে থেকেই নির্ধারণ করা। সেক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনা হলো কোম্পানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কী কাজ করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এবং কখন তা পালন করতে হবে সেই সম্পর্কে আগে থেকেই কর্মসূচি গ্রহণ করা। অন্যদিকে, বিপণন পরিকল্পনা হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি এবং লিখিত দলিল যাতে বিপণন কৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যাবলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। নিম্নে কৌশলগত পরিকল্পনা এবং বিপণনের পরিকল্পনার মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

পার্থক্যেও বিষয়	কৌশলগত পরিকল্পনা	বিপণন পরিকল্পনা
পরিচালনা	কৌশলগত পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত	বিপণন পরিকল্পনায় নিত্যদিনের কার্যসম্পাদন ও ফলাফল পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করা হয়।
কাঠামো	সংগঠনের কার্যক্রম পালনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো তুলে ধরা হয়।	শুধুমাত্র সাংগঠনিক উন্নয়নের জন্য যেকোন একটি স্তরের কাঠামোকে গুরুত্ব প্রদান করে।
দৃষ্টিভঙ্গি	সামগ্রিকভাবে সংগঠন ও এর পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।	কার্যকরী ও পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য সৃষ্টি করে।
কৌশল মূল্যায়ন	সংগঠনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ মূল্যায়ন করা হয়।	সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ও ভিত্তিতে কৌশল গ্রহণের জন্য লক্ষ্যসমূহকে বিভিন্ন উপবিভাগে ভাগ করা হয়।
প্রমাণ	সম্পর্কযুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য প্রমাণের ব্যবস্থা করা হয়।	বিপণন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহকে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য প্রমাণের ব্যবস্থা করা হয়।
পদ্ধতি	কৌশলগত পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি হিসেবে কৌশল গ্রহণ করা হয়।	স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি হিসেবে সংগঠনে বিপণন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

উপরের পার্থক্য থেকে সহজেই বলা যায় যে, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। উভয়ই বিপণন মিশ্রণ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যা বাজারজাতকরণ কৌশল প্রণয়ন ও তা উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক বিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

সারসংক্ষেপ

কোন পণ্য বা সেবার বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতার সেটকেই বাজার বলে। তাই বলা যায়, বাজারমুখী কৌশল হলো ক্রেতামুখী কৌশল। প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের সাথে ক্রেতা, প্রতিযোগী ও কোম্পানি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নকেই বাজারমুখী কৌশল বলা যেতে পারে। প্রযুক্তির উন্নয়ন, তীব্র প্রতিযোগিতা, ক্রেতার প্রত্যাশা ইত্যাদির ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। কাজেই কোম্পানীগুলো বাজারমুখী কৌশল গ্রহণে অধিক মনোযোগী হচ্ছে।ে কৌশলগত পরিকল্পনা হলো কোম্পানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কী কাজ করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এবং কখন তা পালন করতে হবে সেই সম্পর্কে আগে থেকেই কর্মসুচি গ্রহণ করা। অন্যদিকে, বিপণন পরিকল্পনা হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি এবং লিখিত দলিল যাতে বিপণন কৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যাবলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।

পাঠ-১.৬ সামর্থ্যের সংজ্ঞা, পার্থক্যসূচক সামর্থ্য, সামর্থ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ এরং সামর্থ্যের ধরণসমূহ
Definition of Capabilities, Distinctive Capabilities, Identifying Distinctive Capabilities and Types of Distnctive Capabilities

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সামর্থ্য ও পার্থক্যসূচক সামর্থ্য কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- পার্থক্যসূচক সামর্থ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ করতে পারবেন এবং
- পার্থক্যসূচক সামর্থ্যের ধরণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সামর্থ্যের সংজ্ঞা
Definition of Capabilities

সাধারণ অর্থে, কোন কাজ করার শারিরীক বা মানসিক শক্তি এবং অর্জিত প্রয়োজনীয় দক্ষতাকে সামর্থ্য বলা হয়। অর্থাৎ সামর্থ্য হচ্ছে মানসিক বা কায়িক পরিশ্রমের যোগ্যতা বা দক্ষতা। তবে প্রতিষ্ঠানে সামর্থ্য শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পাদনের সক্ষমতাকেই প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বলে। প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বিপণন কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানভেদে সামর্থ্য ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- প্রতিষ্ঠান যদি বড় হয় তবে তার কাজ করার সামর্থ্য ছোট প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অবশ্যই তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তার সামর্থ্যের ব্যবহার বা প্রয়োগের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বলা যেতে পারে যে, সামর্থ্য হচ্ছে একগুচ্ছ দক্ষতা ও সমন্বিত জ্ঞান, যা সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় এবং যা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও সম্পদসমূহ ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে। বিভিন্ন লেখকের সংজ্ঞায় সামর্থ্যের এ বিষয়টিই উল্লেখিত হয়েছে। যেমন-

সামর্থ্য প্রসঙ্গে George S. Day বলেন, “The Capabilities of market-Driven Organizations”, Journal of Marketing এ বলেছেন, “Capabilities are complex bundless of skills and accumulated knowledge, exercised through organizational processes that enable firms to co-ordinate activities and make use of their assets.” অর্থাৎ, সামর্থ্য হচ্ছে সমন্বিত একগুচ্ছ দক্ষতা ও জ্ঞান, যা সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় এবং যা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও সম্পদসমূহ ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কতিপয় পরিমাপযোগ্য সুবিধা, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলি, প্রক্রিয়া বা কাজ সম্পাদনের সক্ষমতা অর্জনকে সামর্থ্য বলে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তাদের সার্বিক কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদনের সক্ষমতা অর্জন করে। এ সক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বা বাহিরেও অর্জিত হতে পারে।

পার্থক্যসূচক সামর্থ্যসমূহ
Distinctive Capabilities

সাধারণ অর্থে পার্থক্যসূচক সামর্থ্য বলতে প্রতিষ্ঠানের এমন কতকগুলো অর্জন বা গুণাবলীকে বুঝায় যা অন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নেই। অন্য কথায়, প্রতিষ্ঠানের কাজ করার দক্ষতা এবং সম্পদ ব্যবহাারের স্বক্ষমতাকে পার্থক্যসূচক সামর্থ্য বলে অভিহিত করা যায়। বিশ্বব্যাপি বহু উৎপাদন বা বিপণনকারী প্রতিষ্ঠাান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের মধ্যে থেকে তাদের কার্যাবলি পরিচালনা করলেও সব প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। এর বহুবিধ কারণ আছে। যেমন- কর্মীদের কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে না পারা, সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারা, প্রযুক্তির সাথে খাপ্ খাইয়ে না চলা ইত্যাদি।

যে সকল প্রতিষ্ঠান কর্মীদের দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে তারাই টিকে থাকে এবং বাজারে সফল হয়। কাজেই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পার্থক্যসূচক সামর্থ্যসমূহ চিহ্নিত করা বাজারমুখী কৌশলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে সাংগঠনিক কাঠামো নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে। তবে একই শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এবং কাজের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাংগঠনিক কাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলেই একটি প্রতিষ্ঠান পার্থক্যসূচক সামর্থ্য অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

পার্থক্যসূচক সামর্থ্য সম্পর্কে বিখ্যাত লেখক John Kay বলেন, "Distinctive capabilities are relevant factor of an organization's resources, Companies with distinctive capabilities have attributes, which other don't have and cannot replicate." অর্থাৎ, পার্থক্যসূচক সামর্থ্য হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সম্পর্কযুক্ত উপাদান। পার্থক্যসূচক সামর্থ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু গুণাবলি রয়েছে যা অন্যদের নেই এবং তারা নকল করতে পারে না।

তাই বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ হলো পার্থক্যসূচক সামর্থ্য। পার্থক্যসূচক সামর্থ্য বিশ্লেষণ একটি প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে এবং এই স্বক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে সাহায্য করে এবং সেইসাথে নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি করে।

পার্থক্যসূচক সামর্থ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ
Identifying Distinctive Capabilities

বিপণন কৌশলের সঠিক নকশা প্রণয়নের জন্য কোম্পানির পার্থক্যসূচক সামর্থ্য অনুধাবন এবং সেগুলো কীভাবে ক্রেতা ভ্যালুর সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্যবিষয়। উচ্চ ব্যবস্থাপনাকে অবশ্যই পার্থক্যসূচক সামর্থ্যেও ওপর ভিত্তি কওে কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে নতুন বাজারে প্রবেশ করা, প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া, ক্রেতাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যালু প্রদান করা এবং প্রতিযোগীকে বাজার প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি কার্যক্রম ফলপ্রসুভাবে করতে হলে পার্থক্য সূচক সামর্থ্য চিহ্নিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত আকৃতি কেমন হবে কিংবা কর্পোরেট স্তরের কৌশল কেমন হবে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা পার্থক্যসূচক সামর্থ্যসমূহ চিহ্নিত করা ব্যতিত সম্ভব নয়। অনেক প্রতিষ্ঠানই এই বিষয়টি বিবেচনায় এনে সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোত্তম কার্যসম্পাদন করে সফল হয়েছে। তাদের সফলতার নেপথ্যে যে বিষয়টি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তা হলো পার্থক্যসূচক কৌশলগত সামর্থ্যের ওপর অধিক মনোনিবেশ করা। পাথ্যক্যসূচক সামর্থ্য দুই ধরনের সুবিধা সৃষ্টি করে। যেমন-

(ক) উন্নতর ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি করার জন্য ব্যাপক অবদান রাখে,
(খ) অল্প খরচে সর্বোত্তম ক্রেতা ভ্যালু সরবরাহ করে।

একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের সামর্থ্য থাকে। কিন্তু প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করে সফল হওয়ার জন্য কোন সামর্থ্যগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে সে সম্পর্কে ব্যবস্থাপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোম্পানির বর্তমান সামর্থ্য চিহ্নিত করা এবং মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হবে। যেমন:

(ক) সামর্থ্য প্রতিযোগীর তুলনায় উন্নততর এবং নকল করা কষ্টকর কিনা?
(খ) বহুমুখী প্রতিয়োগিতামূলক পরিবেশে সামর্থ্য সবসময় প্রয়োগ করা উচিৎ নয়, তবে টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতায় উন্নততর ও নকল করা কষ্টকর কিনা?
(গ) বহুমুখী প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ সামর্থ্যের চেয়ে বেশি শক্তি যোগ করে কিনা?

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা কওে প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। নিচের চিত্রে কোম্পানির প্রত্যাশিত সামর্থ্যগুলো তুলে ধরা হলো:

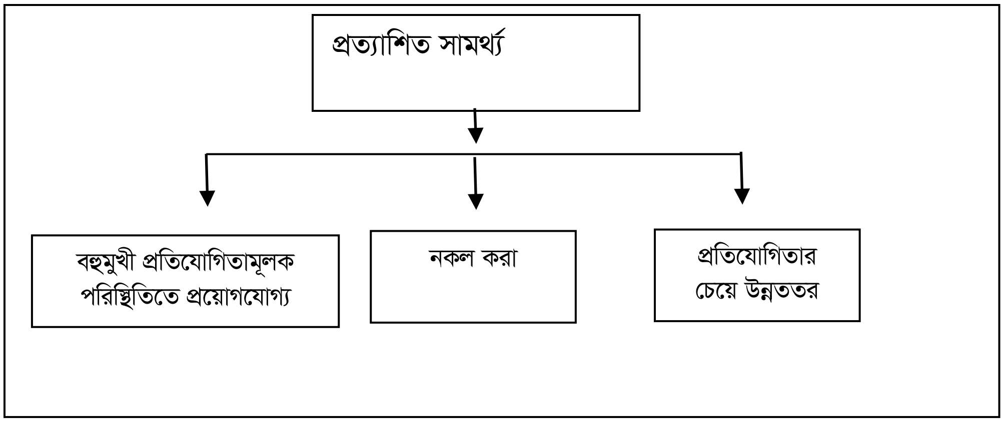

চিত্র: প্রত্যাশিত সামর্থ্যসমূহ

পার্থক্যসূচক সামর্থ্যের ধরণসমূহ

Types of Distnctive Capabilities

পার্থক্যসূচক সামর্থ্য চিহ্নিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যকে কার্যকর উপায়ে শ্রেণিবিভাগ করতে হয়। একটি প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক কিংবা বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ কোন প্রক্রিয়ায় পরিচালিত নাকি উভয় প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হবে শ্রেণিবিভাগ করার সময় তা অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। নিচের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হলো:

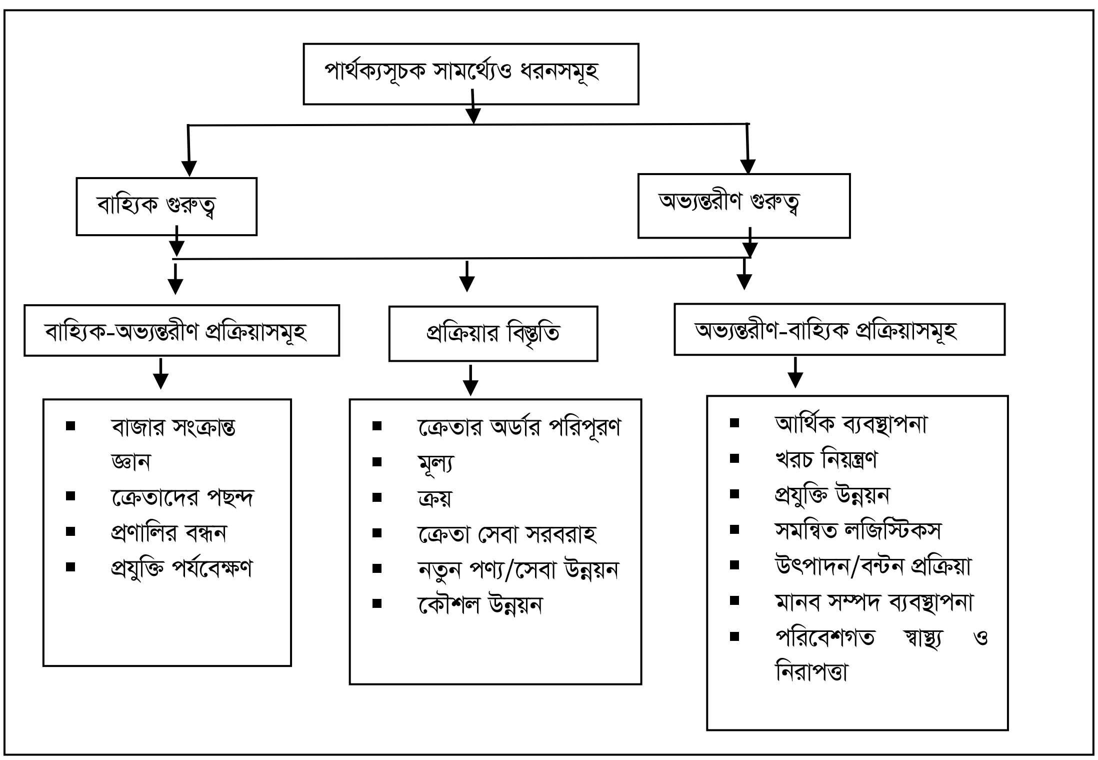

চিত্র: প্রত্যাশিত সামর্থ্যসমূহ

উপরোক্ত চিত্রে সামর্থ্যের উদ্দেশ্য ও গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ এবং অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় কোম্পানি বাহ্যিক পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়, বাজারের ফলাবর্তন (Feedback) নেয় এবং বাহ্যিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক

প্রক্রিয়ায় ক্রেতাদের ভ্যালুর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সন্তুষ্টি বিধানের কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার বিস্তার এবং অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক প্রক্রিয়ার নির্দেশনা দানে এই পদ্ধতি মুখ্য ভূমিকা পালন করে যা সর্বোচ্চ ক্রেতা সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি নতুন পণ্যের সুযোগ, সেবার প্রয়োজনীয়তা, প্রতিযোগীর হুমকি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাজার সম্পর্কে জ্ঞান, ক্রেতাদের পছন্দ, বন্টন প্রণালির বন্ধন এবং প্রযুক্তি পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

সামর্থ্যের প্রক্রিয়ায় আন্তঃসম্পর্কিত সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় তুলে ধরা হয়। যেমন:

(ক) বাজারমুখী প্রতিষ্ঠানগুলোর বাহ্যিক গুরুত্ব
(খ) দলীয় জনগোষ্ঠীকে জড়িয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় কার্যাবলি সম্পাদনের সামর্থ্য
(গ) প্রক্রিয়াটি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়ন ও চিহ্নিতকরণযোগ্য মালিকানার প্রয়োজনীয়তা
(ঘ) প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকলকে তথ্য সরবরাহ করা
(ঙ) প্রক্রিয়াটি অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাথে আন্তঃসম্পর্কিত এবং ব্যবস্থাপনাকে সংযোগের সমন্বয় করতে হয়।

বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই ব্যবসায় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যৌথ কার্যসম্পাদনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকেন এবং বাস্তবে এমনটিই করা উচিৎ। এইভাবে কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথাগত সাংগঠনিক উচ্চক্রম সোপান সংশোধনের কারণে কার্যভিত্তিক দল (প্রকৌশলি, ফ্রিল্যান্স ও মার্কেটিং) এর ওপর গুরুত্ব দেয়া দরকার। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রথাগত কার্যসম্পাদনের পরিবর্তে যৌথ কার্যভিত্তিক কার্যসম্পাদন হলে কিছু ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়। যেমন–

(ক) প্রক্রিয়ামুখী সংগঠনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের দক্ষতা ও চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি
(খ) কার্যভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দক্ষতার তথ্য সংগ্রহ, উপাত্ত বিশ্লেষণ ও বাহ্যিক সহযোগিতা
(গ) প্রক্রিয়ামুখী সংগঠনের সম্পর্কভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ, দল গঠন, তথ্য ব্যাখ্যাকরণ এবং কৌশলগত কারণগুলোর ওপর গুরুত্ব প্রদান।

সারসংক্ষেপ

কোন কাজ করার শারিরীক বা মানসিক শক্তি এবং অর্জিত প্রয়োজনীয় দক্ষতাকে সামর্থ্য বলা হয়। অর্থাৎ সামর্থ্য হচ্ছে মানসিক বা কায়িক পরিশ্রমের যোগ্যতা বা দক্ষতা। তবে প্রতিষ্ঠানে সামর্থ্য শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পাদনের সক্ষমতাকেই প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বলে। প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বিপণন কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানভেদে সামর্থ্য ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পার্থক্যসূচক সামর্থ্য বলতে প্রতিষ্ঠানের এমন কতকগুলো অর্জন বা গুণাবলীকে বুঝায় যা অন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নেই। বিপণন কৌশলের সঠিক নকশা প্রণয়নের জন্য কোম্পানির পার্থক্যসূচক সামর্থ্য অনুধাবন এবং সেগুলো কীভাবে ক্রেতা ভ্যালুর সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্যবিষয়। উচ্চ ব্যবস্থাপনাকে অবশ্যই পার্থক্যসূচক সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে নতুন বাজারে প্রবেশ করা, প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া, ক্রেতাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যালু প্রদান করা এবং প্রতিযোগীকে বাজার প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি কার্যক্রম ফলপ্রসুভাবে করতে হলে পার্থক্য সূচক সামর্থ্য চিহ্নিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. বিপণন বলতে কী বুঝায়?
২. বিপণনের মৌলিক ধারণাসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. বিপণনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. বিপণন প্রক্রিয়াটি চিত্রসহকারে বুঝিয়ে লিখুন।
৫. প্রয়োজন, অভাব ও চাহিদা বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহকারে বুঝিয়ে লিখুন
৬. কৌশলগত বিপণন কেন প্রয়োজন?- ব্যাখ্যা করুন।
৭. কৌশলগত বিপণনের প্রকৃতি ও কার্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৮. বিপণনকারী কিভাবে ক্রেতা সম্পর্ক সৃষ্টি করে ও তা ধরে রাখে?- ব্যাখ্যা করুন।
৯. ক্রেতা ভ্যালু ও ক্রেতা সন্তুষ্টি বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণসহকারে লিখুন।
১০. ক্রেতা ভ্যালু ও ক্রেতা ইক্যুইটি বলতে কী বোঝায়?
১১. কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী? বুঝিয়ে লিখুন।
১২. কৌশলগত পরিকল্পনার ভিত্তিসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
১৩. বিপণন পরিচিতিকরণ বলতে কী বুঝায়? বর্ণনা করুন।
১৪. বাজার পরিচিতিকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
১৫. ক্রেতা ভ্যালু কী? বিপণনকারী কীভাবে ক্রেতা ভ্যালু অর্জন করতে পারে।
১৬. বাজার পরিচিতিকরণের মাধ্যমে একটি কোম্পানী কী কী সুবিধা পেতে পারে? উদাহরণসহকারে বুঝিয়ে লিখুন।
১৭. ক্রেতামুখী বিপণন কৌশল কী? ক্রেতামুখী বিপণন কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
১৮. বাজারমুখী কৌশল বলতে কী বুঝায়? বাজারমুখী কৌশলের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
১৯. সামর্থ্য বলতে কী বুঝায়? পাথক্যসূচক সামর্থ্যের ধরণসমূহ বর্ণনা করুন।

তথ্যসূত্র:

Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Principles of Marketing* (16th Edition). Pearson Education.

American Marketing Association (n.d.). *Definitions of Marketing.* Retrieved from: What is Marketing? — The Definition of Marketing — AMA (Accessed: October 3, 2024).

Cravens, D. W., & Piercy, N. F. (2008). *Strategic Marketing* (9th Edition). McGraw-Hill Education, Irwin.

Sahaf, M. A. (2019). Strategic Marketing: Making Decisions for Strategic Advantage (2nd Edition). PHI Learning Pvt. Ltd.

Day, G. S. (1990). *The Market Driven Strategy: Process for Creating Value*. Free Press, New York.

John Kay (1993). *Foundations of Corporate Success*. Oxford University Press, Oxford.